Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-2 Issue-2 January 2024
ISSN 2583-6706 (Online)

নজরুলের কবিতায় চিত্রকল্পের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য
একটি নন্দনতাত্ত্বিক সমীক্ষা

মোরশেদুল আলম

Link : https://bit.ly/42hB4c3

সারসংক্ষেপ : কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) কবিতায় এমন অনেক ইমেজ বা চিত্রকল্প নির্মিত হয়েছে, যা বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিরল, অনন্য, অসাধারণ। নজরুল তাঁর কবিতামালায় সচেতনভাবে চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, এমন কথা বোধকরি বলা যাবে না। বস্তুত, সহজাত কবিসত্তার প্রেরণায়, প্রাতিস্বিক শিল্পবোধের আন্তরধর্মে তাঁর কবিতামালায় নির্মিত হয়েছে বহুবর্ণিল চিত্রকল্প; এবং নজরুলের কবিতায় চর্চিত এই সব চিত্রকল্পসমূহের মধ্যে বাঙ্ময় হয়ে আছে তাঁর রোম্যান্টিক কবি-আত্মার মৌলসত্তা। মূলত, বিষয় ও প্রকাশে যে অবিচ্ছেদ্যভাব, ছন্দে ও সুরে যে সমন্বয়, ভাব ও রূপে যে একাত্মতা, সসীমে ও অসীমে যে আসঙ্গ-তাকেই তিনি বহুবর্ণিল রূপকল্পে রূপদান করে স্বকৃত কবিভাষায় অতুলনীয়, অর্থমর্মরিত করে তুলেছেন। বহু বর্ণময় চিত্রকল্প প্রয়োগে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতামালা কতটুকু নান্দনিক ও শিল্পসফল হয়ে উঠেছে, তার স্বরূপ-সন্ধানই এই বর্তমান গবেষণা-প্রবন্ধের অন্বিষ্ট বিষয়।

সূচক শব্দ : কাজী নজরুল ইসলাম, কবিতা, চিত্রকল্প, শিল্পবোধ, রোমান্টিক, কবি-আত্মা, বহুবর্ণিল, শব্দরাশি, মৌলসত্তা

১

আধুনিক কাব্যচৈতন্যে চিত্রকল্প বা ইমেজ কবিতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রূপে স্বীকৃত। বিভিন্ন অলঙ্কারাশ্রয়ী চিত্রকল্প একই সঙ্গে কবি ও কবিতার সংযোগসূত্র; কবিভাষায় ভাবপরিবহণের সঙ্গে কবিমানসের রূপরেখা উন্মোচনে এর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ, সুদূরপ্রসারী। কেননা, চিত্রকল্প তো কেবল নিছক চিত্ররচনা নয়, কবিকল্পনার বুননে সেখানে অনুস্যূত হয় সেই রহস্যাত্মক প্রবর্তনা-যা চিত্রাতিরেক। চিত্রকল্পকে বলা হয় কবিতার সেই মায়াবী মুকুর, যেখানে একই সঙ্গে বিম্বিত হয়ে ওঠে স্রষ্টার চৈতন্য, সৃষ্টির লাবণ্য। চিত্রকল্পের শরীরে ফুটে ওঠে একটি আবেগী চিত্র এবং দৃশ্যময়তা; তবে বহির্জাগতিক দৃশ্যের সরাসরি অনুকরণকে কোনো সূত্রেই চিত্রকল্পের মর্যাদা দেয়া চলে না। উপমান-চিত্রের আবেগী গুণ, কল্পনাপ্রসারী চারিত্র এবং উদ্ভাসনক্রিয়াজাত তৃতীয় মাত্রার ব্যঞ্জনা চিত্রকল্পের অনিবার্য শর্ত। একটি সার্থক চিত্রকল্প রঙে-রেখায়-শব্দে-বর্ণে প্রাণময় হয়ে নির্মাণ করে কবিতার মূল সত্তা ও চারিত্র সৌন্দর্য; তার ঐশ্বর্য।[১] চিত্রকল্প ব্যঞ্জনাকে মনোভূমির গোচরে আনে, কবিতার অন্তর্বয়নে আনে সংহতি; সর্বোপরি অলঙ্কারের বহুল ব্যবহারগত দীনতাকে দূর করে কবিতাকে অন্তর্লীন সুরসাম্যে করে বিধৃত। চিত্রকল্প কবির মনোভূমিতে রচিত; শব্দে-বর্ণে-ভাষায় ও কবিভাবে তার দ্যুতিময় স্ফুরণ। কবির অবচেতন ভাবনা ও চেতনার অপরূপ কল্পপ্রতিমা হলো চিত্রকল্প বা ইমেজ। একজন কবির কবিতায় ব্যবহৃত প্রতিটি চিত্রকল্প, বস্তুত, কবিতার মৌল-অন্বিষ্টের সংকেতবাহী। কাব্যচেতনার সঙ্গে চিত্রকল্পের যোগ আত্মিক। চেতনার অনুষঙ্গে চিত্রকল্প জন্মলাভ করে, আবার চিত্রকল্পের শরীরে চৈতন্য ধরা দেয় চিত্রলতায়। চিত্রকল্পের মাধ্যমে আমরা কবি-আত্মার পরিচয় লাভ করি, উপলব্ধি করি তাঁর কল্পনাপ্রবণতার চারিত্র। কবিভাষায় ব্যবহৃত প্রতিটি ইমেজ বা চিত্রকল্প কবির স্মৃতি-অভিজ্ঞতা-অনুভব ও জীবনার্থেরই রূপান্তরিত শিল্পপ্রতিমা।[২] এই অনিবার্যসূত্রেই উল্লেখ্য, বহুবর্ণময় শব্দরাশি এবং বিচিত্র মাত্রিক অলঙ্কার সমবায়ে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)এর কবিতায় এমন অনেক ইমেজ বা চিত্রকল্প নির্মিত হয়েছে, যা বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিরল, অনন্য, অসাধারণ।নজরুলের কবিতায় চর্চিত এই সব চিত্রকল্পসমূহের মধ্যে বাঙ্ময় হয়ে আছে তাঁর রোম্যান্টিক কবি-আত্মার মৌলসত্তা। বলাবাহুল্য, নজরুলের বিরলপ্রসূ মেধা ও মনোজ কীর্তি তাঁর চর্চিত এই চিত্রকল্প সমূহকে দীপ্র, স্বস্বভাবী স্বাতন্ত্র্য দান করেছে, সন্দেহ নেই।

২

নজরুলের কবিতাকে সবিশেষ ঐশ্বর্যশালী করেছে মিথ-পুরাণ-আশ্রিত প্রচুর সার্থক চিত্রকল্প। যেহেতু বিদ্রোহ আর প্রেম, অর্থাৎ তূর্য আর বাঁশি — নজরুলের কবিতাকে এ-দু'ভাগে ভাগ করে ফেলা সম্ভব; তাই এই চিত্রকাল্পিক দ্বিভাজনের মধ্যে রয়েছে তাঁর কবিতার পরতে পরতে হিন্দু পৌরাণিক নায়ক শিবের স্বভাব-যিনি একাধারে ধ্বংস ও নির্মাণের দেবতা। বলাবাহুল্য, ভারতীয় মিথ

নজরুলের কাব্যে সৃজিত চিত্রকল্পসমূহে যে শিল্পবলয় রচনা করেছে, তার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপিত হয়েছেন নটরাজ শিব। এই অতি শক্তিধর দেবতা নজরুলের সুপ্তিমগ্ন চেতন-অবচেতনায় ও শিল্পসূত্র-যোজনায় বিচিত্র;যেমন: রুদ্র, ভৈরব, দিগম্বর, ধূর্জটি, ব্যোমকেশ, পিনাকী, ত্রিশূলী, শিব, মহেশ, শঙ্কর, নটরাজ প্রভৃতি। নটরাজ শিবের এই বিচিত্র ভাববস্তুর, রূপান্তরিত ইমেজ এবং সঞ্চরণশীল রূপকতত্ত্বের বৈভবের কারণ নজরুলের উদ্বোধিত আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পরূপায়ণ ও তার উপায়-বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্য। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও, নটরাজ শিবই নজরুল ইসলামের মিথ-বলয়ের কেন্দ্রবিন্দু এবং তাঁর মর্মকোষ ও অস্তিত্বমূল উৎসারিত অভীপ্সার প্রত্নপ্রতিমা। নটরাজ শিব যে প্রত্নপ্রতিমায় সংস্থাপিত এবং তা যে চিত্রকল্পময়, সংকেতময় ও প্রতীকী ব্যঞ্জনাময়-এর কারণ নটরাজ শিব ভাস্কর্যের মতো নিশ্চল, নৃত্যপদপাতে প্রবল বেগবান এবং ধ্বংস-সৃষ্টি, সুন্দর-অসুন্দর, কল্যাণ-অকল্যাণের আবেগে অন্তর্ছন্দময়।[৩] এই অনিবার্যকারণেই একের পর এক শিব-আশ্রিত চিত্রকল্প নজরুলের কবিতাকে করে তুলেছে ক্রমশ ঋদ্ধ থেকে ঋদ্ধতর :

১. আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর! [বিদ্রোহী/ অগ্নি-বীণা]
২. ধূর্জটি-জটা-বাহিনী গঙ্গা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলে,
তারি নিচে চিতা-যেন গো শিবের ললাটে অগ্নি জ্বলে! [ইন্দ্রপতন/ চিত্তনামা]
৩. জ্বলে ওঠ এইবার মহাকাল-ভৈরবের নেত্রজ্বালা-সম ধক্ ধক্,
হাহাকার-করতালি বাজা! জ্বালা তোর বিদ্রোহের রক্তশিখা অনন্ত পাবক। [পূজারিণী/ দোলন-চাঁপা]

উপরিউক্ত প্রতিটি উদ্ধৃতিই চিত্র ও চিত্রকল্পময়; এবং উদ্ধৃতিগুচ্ছ কেবলমাত্র সমুজ্জ্বল চিত্রাংশের সমবায় মাত্র নয়, বরং অন্তর্গতির আবেগে শিল্পে প্রমূর্ত। অপরপক্ষে মিথের ঘটনা, চিত্র ও চরিত্রগর্ভে অনুভূতিপুঞ্জ প্রসারিত করে নজরুল সংগ্রহ করেছেন শক্তি-প্রমত্ত ধ্রুপদী আবেগ। মিথের রূপকতত্ত্ব এবং কবিচিত্তে শিব-সংক্রান্ত বিচিত্র মানস-আভাস জৈব প্রতিক্রিয়ায় পুনর্জাত হয়েছে সমকালস্পর্শী চিত্র ও চিত্রকল্পে।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সৃজিত চিত্রকল্পসমূহে অবরুদ্ধ, নিরস্তিত্ব এবং শক্তিহীন সমাজের তারুণ্য ও পৌরুষের প্রতীক হিসেবেই মিথ-উৎসকে মূলত ব্যবহার করেছেন। ভারতীয়, বাংলার দেশজ, ইউরোপীয় এবং ইসলামি ও মধ্যপ্রাচ্যীয় মিথ-পুরাণ-ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যময় জগৎ নজরুলের জীবনাবেগ ও শিল্পাবেগের ক্ষেত্রে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তার আবেদন দূরসঞ্চারী। প্রত্যক্ষভাবে কখনো, কখনো অবচেতনার নিগূঢ় স্পন্দনে, আবার কখনো-বা অভীপ্সার অনিবার্য রূপচিত্র নির্মাণের প্রয়োজনে তিনি বহুবর্ণিল মিথ-উৎসের শিল্পসূত্র প্রয়োগ করেছেন; এবং এক্ষেত্রে চিত্রকল্প সৃজনে তাঁর শিল্পসিদ্ধি নিঃসন্দেহে তুলনারহিত, বিরল, অনতিক্রান্ত :

১. আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় কবির বিশ্ব। [বিদ্রোহী/ অগ্নি-বীণা]
২. স্বর্গ-বেশ্যা ঘৃতাচী-পুত্র হলো মহাবীর দ্রোণ। [বারাঙ্গনা/ সাম্যবাদী]
৩. ভিক্ষা-ঝুলি নিয়ে ফেরে দ্বারে দ্বারে ঋষি
ক্ষমাহীন হে দুর্বাসা। [দারিদ্র্য/ সিন্ধু-হিন্দোল]

সমকালীন বিপন্নতা ও ঔপনিবেশিক শক্তিকে পরাজিত করবার মানসে শক্তি-উৎসের সন্ধানই কেবল নয়, কবিচিত্তের অন্তর্গত বিরহ-বেদনা প্রকাশের অমোঘ উৎস হিসেবে ভারতীয় মিথের বিবিধ অনুষঙ্গ ও দেশজ মিথ-পুরাণের মিথষ্ক্রিয়া নজরুল-সৃষ্ট চিত্রকল্পমালাকে উত্তীর্ণ করেছে এক স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনালোকে :

একান্তে পড়ে মনে
বনলতা সনে
বিষাদিনী শকুন্তলা কেঁদেছিল এই সুরে বনে সঙ্গোপনে। [পূজারিণী/ দোলন-চাঁপা]

ইসলামি ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের মিথ-উৎস, পার্সিয়ান মিথ এবং ইসলাম-পূর্বকালের আরবীয় মিথ-পুরাণ-ঐতিহ্য নজরুল তাঁর চিত্রকল্পে ব্যবহার করেছেন আশ্চর্য সাবলীলতায়। এবং এক্ষেত্রে তাঁর শিল্পীচৈতন্য এক স্বতন্ত্র অভিপ্রায়ের বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট, ক্রমলক্ষ্যমুখী। অবরুদ্ধ, রক্তাক্ত সমাজের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষায় নজরুলের জাগ্রত কবিচৈতন্য যখন সামূহিক বিদ্রোহ ও প্রতিবাদকে দান করেছে কাব্যরূপ, তখন ভারতীয় মিথ-পুরাণ-ঐতিহ্যের সমান্তরালে মধ্যপ্রাচ্যীয় মিথ-পুরাণ ও ঐতিহ্যপুঞ্জও অনুরূপ ভাবব্যঞ্জনায় হয়েছে অভিব্যক্ত। যেমন :

১. জয়ধ্বনি বাজে মোর স্বর্গদূত 'মিকাইলের' আতশী-পাখায়। [ঝড় : পশ্চিম তরঙ্গ/ বিষের বাঁশী]
২. ঐ গিরি শিরে মজনু কি গো আজিও দিওয়ানা হয়ে
লায়লির লাগি নিশিদিন জাগি ফিরিতেছে রোয়ে রোয়ে? [কর্ণফুলি/ চক্রবাক]
৩. বেহেশতে সব ফেরেশতাদের বিধাতা কহেন হাসি,
হারুতে-মারুতে কি করেছে দেখ ধরণী সর্বনাশী! [পাপ/ সাম্যবাদী]

চিত্রকল্পসমূহে নজরুলের পুরাণ প্রয়োগের উজ্জ্বলতম প্রাতিস্বিক দিকটি এই যে, তিনি হিন্দু ও মুসলিম তথা বাঙালির সমবায়ী ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন একই সঙ্গে। উভয় ঐতিহ্যের এই অঙ্গাঙ্গি পরিচর্যায় কাজী নজরুল ইসলাম একক, অনন্য এবং তাঁর এই বিরলপ্রজ কীর্তি বাঙালির ভাষা-সাহিত্যে তুলনাহীন এক মহান শিখরে অধিষ্ঠিত করেছে তাঁকে। বলাবাহুল্য, ইসলামি মিথ-ঐতিহ্য ও ভারতীয় পুরাণের যুগল প্রয়োগ নজরুলের চিত্রকল্পসমূহকে দান করেছে দ্যুতিময় বিভা :

১. তাজি বোররাক্ আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মত-হ্রেষা হেঁকে চলে! [বিদ্রোহী/ অগ্নি-বীণা]
২. চিত্ত-চিতার ছাই মেখে শিব সৃষ্টি-বিষাণ ঐ বাজায়,
জন্ম নেবে মেহদী-ঈসা ধরার বিপুল এই ব্যথায়। [সান্ত্বনা/ চিত্তনামা]

নজরুল তাঁর সৃজিত চিত্রকল্পে ইউরোপীয় মিথ-ঐতিহ্য তেমন একটা ব্যবহার করেন নি। তবু যে দু'-একটি ইউরোপীয় মিথ তিনি ভাব ও বক্তব্য প্রকাশের অনিবার্য তাগিদে প্রয়োগ করেছেন-তা যেমন তাঁর চিত্রকল্প সৃষ্টির বৈভবকে প্রোজ্বল করে তোলে, তেমনি উন্মোচন করে দেয় তাঁর মিথচেতনার বৈচিত্র্যগামী স্বভাববৈশিষ্ট্যকে। যেমন :

১. আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,
মহা-সিন্ধু উতলা ঘুম ঘুম। [বিদ্রোহী/ অগ্নি-বীণা]
২. কখন আসিল 'প্লুটো' যমরাজ নিশীথ পাখায় উড়ে
ধরিয়া তোমায় পুরিল তাহার আঁধার বিবর পুরে। [নারী/ সাম্যবাদী]

কেবলমাত্র মিথ-পুরাণ-ঐতিহ্য আশ্রয়ী চিত্রকল্পমালাই নয়, বহুবিচিত্র উৎস থেকে আহৃত রঙ-রূপ-রস-গন্ধরূপময় চিত্রকল্প নজরুলের শিল্পীসত্তার স্বরূপকেই শুধু চিহ্নিত করেছে তাই নয়, একই সঙ্গে উন্মোচিত করেছে তাঁর প্রেমজ কামনা ও স্বপ্নময় আবেগের সত্যস্বরূপও। কেননা আমরা জানি, 'আধুনিক কবিতায় মানুষের মগ্নচেতনার অনেক স্বপ্ন ও প্রত্যয় এবং সামূহিক নির্জ্ঞান মিথ আকারে চিত্রকল্পে রূপলাভ করেছে।'[৪] নজরুল-চর্চিত এই শ্রেণির চিত্রকল্পমালায় পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রভাব সংযোজন করেছে এক অভিনব বৈচিত্র্য। বিশেষত ইন্দ্রিয়চেতনার পরস্পর মিশ্রণ ও রূপান্তর অর্থাৎ 'সিনেসথেসিয়া'র অনিবার্য প্রভাব পাঠকচৈতন্যে জাগ্রত করেছে এক অভাবিত স্পন্দন-যেখানেরূপ-রঙ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সব পরস্পর সমন্বিত হয়ে অথবা একের দেহে অন্যটি গড়িয়ে পড়ে পাঠককে নীত করেছে এক ভিন্ন জগতে; এবং তার অনিবার্য ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে এক দীর্ঘ, জটিল ভাবঋদ্ধ চেতনাগভীর চিত্রমালা। কতিপয় দৃষ্টান্ত :

১. হে সুন্দর! জল-বাহু দিয়া
ধরণীর কটিতট আছ আঁকড়িয়া
ইন্দ্রনীলকান্তমণি মেখলার সম,
মেদিনীর নিতম্ব-দোলার সাথে দোল অনুপম। [সিন্ধু : তৃতীয় তরঙ্গ/ সিন্ধু-হিন্দোল]
২. কোথা হতে কেন এই মৃগ-মদ-গন্ধ-ব্যথা আসে?
মন-মৃগ ছুটে ফেরে, দিগন্তের দুলি মোর ক্ষিপ্ত হাহাকার-ত্রাসে!
কস্তুরী হরিণ-সম
আমারি নাভির গন্ধ খুঁজে ফেরে গন্ধ-অন্ধ মন-মৃগ মম! [পূজারিণী/ দোলন-চাঁপা]

নজরুলের অধিকাংশ কবিতাই এইভাবে বিচিত্র ইন্দ্রিয়সংবেদনায় গ্রথিত একাধিক চিত্রকল্পে দীর্ঘায়ত। ইন্দ্রিয়-সংরাগ নির্দেশিত কোনো কোনো চিত্রকল্পে দৃশ্যময়তার সঙ্গে ঘ্রাণময়তা যুক্ত হয়ে নজরুলের কবিভাষাকে করেছে চিত্তাকর্ষক, আবেগী, কান্তিময়। বস্তুত, কাজী নজরুলের এই অনন্য চিত্রবিহারী মুগ্ধতা তাঁর কবিতার এক অসামান্য বৈশিষ্ট্য। এই কাব্য-প্রযুক্তি যেমন সৌন্দর্যকে প্রসারিত করে, তেমনি আবার স্বীয় উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে ইন্দ্রিয়জ অস্তিত্বে প্রকাশ করার মাধ্যমে পাঠক-সামীপ্য সহজ

সংক্রামিত করে তোলে; এবং তখন তার স্বতন্ত্র স্বরধ্বনি, চঞ্চলতা, অভিপ্রায়, বাক-বিভূতি, সংশয়তা ও সংগোপনতা পাঠক অবগাহনে অভিষিক্ত হয় সহজেই। এই শ্রেণির গন্ধরূপময় চিত্রকল্প মূলত নজরুলের প্রেম, প্রেমিকা ও প্রেমময় স্মৃতিলালিত :

১. প্রথম উঠিল কাঁদি অপরূপ ব্যথা-গন্ধ নাভি-পদ্ম-মূলে!
খুঁজে ফিরি কোথা হতে এই ব্যথা ভারাতুর মদ-গন্ধ আসে। [পূজারিণী/ দোলন-চাঁপা]

২. তোমার মদির শ্বাসে কি মোর গুলের সুবাস মেশে?
আমার বনের কুসুম তুলি পর কি আর কেশে? [নদী পারের মেয়ে/ চক্রবাক]

নজরুলের কবিতায় সৃজিত দৃশ্যরূপময় চিত্রকল্পের সংখ্যাই অধিক; তবে কোনো কোনো চিত্রকল্পে দৃশ্যময়তার সঙ্গে শ্রবণসুভগতাও আছে। অসাধারণ ব্যঞ্জনাঋদ্ধ দু'টি শ্রুতিনির্ভর চিত্রকল্পের দৃষ্টান্ত :

১. রেশমি চুড়ির শিঞ্জিনীতে রিমঝিমিয়ে মরম কথা
পথের মাঝে চমকে কে গো থমকে যায় ঐ শরম-লতা। [পাপড়ি-খোলা/ ছায়ানট]

২. বিপ্লবের লাল ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ-
ঐ শোনো, শোনো তার হ্রেষার চিক্কুর,
ঐ তার ক্ষুর-হানা মেঘে! [ঝড় :পশ্চিম তরঙ্গ/ বিষের বাঁশী]

এই দৃষ্টান্তমালা ছাড়াও শ্রুতিচেতনা ব্যবহার করে নজরুল তাঁর স্বোপার্জিত কবিভাষায় সৃজন করেছেন আরো কিছু অপূর্ব রূপচিত্র। শ্রুতিমধুর ধ্বনিচেতনার অসাধারণ সূক্ষ্মতা ও অনন্যতা অভিব্যঞ্জনা লাভ করেছে এই ধরনের চিত্রকল্পে। এক্ষেত্রে শব্দের প্রতীকী প্রয়োগ-প্রমূর্ততা তাঁর কবিভাষাকে সন্দীপিত করেছে অতিশয় ঋদ্ধ চিত্রলতায় :

১. সেদিন শ্রাবণে
ছলছল জল-চুড়ি-বলয়-কঙ্কনে
শুনিয়াছি যে-সঙ্গীত, যার তালে তালে
নেচেছে বিজলী মেঘে, শিখা নীপ-ডালে।...
উড়ে গেছে দূর বনে ময়ূরীরা আজ,
রোয়ে রোয়ে বহে নাকো পুবালি বাতাস,
শ্বসে না ঝাউয়ের শাখে সেই দীর্ঘশ্বাস। [শীতের সিন্ধু/ চক্রবাক]

নজরুলের প্রেম ও সৌন্দর্যের পটভূমিকায় রচিত কবিতার চিত্রকল্পগুলিতে প্রকৃতি বিচিত্র রূপে অবতীর্ণ। অনুভূতির সূক্ষ্মপ্রকাশে, কল্পনার অভিনবত্বে, স্নিগ্ধ-সুন্দর-মহিমোজ্জ্বল পটভূমিকায় সূক্ষ্ম, তীব্র রোম্যান্টিক বেদনাবোধের সঞ্চারণে তাঁর ললিত, স্নিগ্ধকবিতামালায় চর্চিত এই চিত্রকল্পগুলি অবিস্মরণীয়, অনবদ্য। এই শ্রেণির চিত্রকল্পের চরণমালা যখন সম্প্রসারিত হয় মূর্ত-বিমূর্ত রূপচিত্রে, তখন তা আর পুরোপুরি পঞ্চেন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে না; অনুভব আর বোধিতে নির্মাণ করে নিতে হয় :

১. আশ্বিনের প্রভাতের মতো ছলছল
করে ওঠে সারা হিয়া, শিশির-সজল
টলটল ধরণীর মতো করুণায়! [দারিদ্র্য/ সিন্ধু-হিন্দোল]

২. পাখি উড়ে যায় যেন কোন মেঘলোক হ'তে
সন্ধ্যা-দীপ-জ্বালা গৃহপানে ঘর-ডাকা পথে। [বেলাশেষে/ দোলন-চাঁপা]

৩. উদাস দুপুর কখন গেছে, এখন বিকাল যায়,
ঘুম জড়ানো ঘুমতি নদীর ঘুমুর-পরা পায়! [চৈতি হাওয়া/ ছায়ানট]

গভীর অতিপ্রাকৃত সুরের সঙ্গে বেদনাবোধের রোমান্টিক তীব্রতা ও আকুলতা যাপিত জীবনের গভীরতম ব্যাকুলতায়, উন্মাদনায়, অস্থিরতায়, শব্দধ্বনির মাধুর্যে, ছন্দের তরঙ্গে নজরুলের কবিতায় চিত্রকল্পের পর চিত্রকল্পে কখনো কখনো হয়ে উঠেছে অপরূপ, অনবদ্য। কবিতামালায় কবি নজরুলের শিল্পবোধের যে পশ্চাৎ-আভাস উদ্ঘাটিত, তাতে তাঁর ব্যক্তিক নিঃসঙ্গতা যেমন অচ্ছেদ্য, তেমনি রোম্যান্টিকতাও তাঁর এক সুরেলা ভুবন। তিনি যেমন অতিপ্রজ, তেমনি তাঁর কবিতাও প্রায়শ দীঘল ও স্বাস্থ্যদীপ্ত। নিমগ্ন কণ্ঠস্বরে যেন তিনি নিটোল, চিত্রল স্বস্বভাবী রূপচিত্র নির্মাণের মাধ্যমে শব্দকে চারিয়ে দেন অন্তর্বাহী ভাব-সম্পদ সম্প্রসারণ ও সংশ্লেষের লক্ষ্যে তাঁর সৃজিত চিত্রকল্পমালায় :

১. শীতের কুহেলি ঢাকা বিষণ্ণ বয়ানে
কিসের করুণা মাখা! কুলের সিথানে
এলায়ে শিথিল দেহ আছ একা শুয়ে-
বিশীর্ণ কপোল বালু-উপাধানে থুয়ে! [শীতের সিন্ধু/ চক্রবাক]

২. ঘর-দুয়ার আজ বাউল যেন শীতের উদাস-মাঠের মত,
ঝরছে গাছে সবুজ পাতা আমার মনের-বনের যত। [উন্মনা/ সিন্ধু-হিন্দোল]

৩. উদাস বায়ু ধানের ক্ষেতে ঘনায় যখন সাঁঝের মায়া,
দুই জনারই নয়ন-পাতায় অমনি নামে কাজল-ছায়া। [মরমী/ ছায়ানট]

কখনো কখনো কবিভাষাকে সংবেদনময়, আবেগী, লাবণ্যময়, গীতল ও রমণীয় করে তুলতে নজরুল কবিতার পর কবিতায় উপর্যুপরি ব্যবহার করেন শিউলি ফুলের চিত্রকল্প। নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল ও সহজে শনাক্তযোগ্য এইসব রূপচিত্রে যে আভাস পাঠক-মনীষায় সংক্রামিত করেছেন তিনি, তা বেদনার্ত হয়েও পরম ঋদ্ধি সম্পন্ন, পরম আস্বাদনময়। বস্তুত, এই চিত্রকল্পগুলিতে নজরুলের বাস্তব অভিজ্ঞান ও সৌন্দর্যচেতনা এক পারস্পরিক সূত্রে ও অনিঃশেষ সম্বন্ধে প্রতিস্থাপিত:

১. ঐ শেফালিকা-তলে কে বালিকা চলে?
কেশের গন্ধ আনিছে আশিন হাওয়া! [আগমনী/ অগ্নি-বীণা]

২. আবার যেদিন শিউলি ফু'টে ভরবে তোমার অঙ্গান,
তুলতে সে-ফুল গাঁথতে মালা কাঁপবে তোমার কঙ্কণ। [অভিশাপ/ দোলন-চাঁপা]

৩. কুমারীর ভীরু বেদনা-বিধুর প্রণয়-অশ্রুসম
ঝরিছে শিশির-সিক্ত শেফালি নিশি-ভোরে অনুপম। [বর্ষা-বিদায়/ চক্রবাক]

বলতে দ্বিধা নেই, শুরু থেকে শেষাবধি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা বর্ণোজ্জ্বল, চিত্রল, গীতল ও রূপকল্পময়। তাঁর শৈশব-কৈশোর, তাঁর স্মৃতিময় গ্রাম-নিসর্গ, তাঁর দ্রোহী ও রোম্যান্টিক মানসতা, যাপিত জীবনের বহুবর্ণময় খণ্ডচিত্রমালা প্রভৃতির সমাহারে নজরুল কবিতার পর কবিতায় নির্মাণ করেছেন যেন এক-একটি অনন্য 'ল্যান্ডস্কেপ' কখনো মনোহর, নম্র মাধুর্যে সুশোভন ও প্রোজ্জ্বল চিত্র সমবায়ে চিত্রকল্প; আবার কখনো বা রক্তাক্ত, দ্রোহী, রক্তিম ও সঘন সমাজমনস্কতাজাত অভিজ্ঞান পরিস্রুত রূপময় চিত্রমালা। কবিতার বক্তব্য আর ভাষাকে রমণীয়, আনন্দঘন, বিষাদময়, সৌন্দর্যসিক্ত আর সাংগীতিক করে তুলতে তিনি একদিকে যেমন নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন নিসর্গ-প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যলোক থেকে চাঁদ, জ্যোৎস্না, নদী, পাখি; তেমনি অন্যদিকে কবিতার ভাষা আর ভাবকে উদ্দাম, অস্থির, তীব্র, দীপ্র ও গতিময় করে তুলতে তিনি পরিচর্যা করেন বিপ্লব, গতি আর তীব্রতার অনন্য প্রতীক অশ্বের অজস্র চিত্রকল্পময় প্রতীকী প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ। এই রূপচিত্রগুলি বহুবর্ণিল চেতনা-সংক্রামে আরক্তিম, আত্মতাড়িত, আলগ্ন যদিও নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত, দুঃখ-বেদনায় নীল; তবুও স্বোপার্জিত জীবনের ভরাট কণ্ঠস্বরে পৌরুষশোভন, স্ব-চিহ্নে নতুন ও দ্যুতিবান :

১. ঐ সে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িৎ চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড়-তুফানে! [প্রলয়োল্লাস/ অগ্নি-বীণা]

২. মন ছুটছে গো আজ বল্গা-হারা অশ্ব যেন পাগলা সে,
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে! [আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে/ দোলন-চাঁপা]

৩. বিপ্লবের লাল-ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ-
ঐ শোনো, শোনো তার হ্রেষার চিক্কুর,
ঐ তার ক্ষুর-হানা মেঘে! [ঝড়/ বিষের বাঁশী]

নজরুলের যে-সব কবিতায় আবেগের মত্ততা ও কল্পনার সুদূরপ্রসারী বিস্তার লক্ষণীয়, সেই সব কবিতার কবিভাষায় ব্যবহৃত রূপকল্পে এসেছে এক অস্থির গতিশীল প্রবাহ। সত্য ও মুক্ত অগ্নিগর্ভ উচ্চারণে একটি বিরল ও ওজস্বীধারার গতিকে অধিক তীক্ষ্ণ শব্দবাণে বেগবান করে তোলার দীপ্র অভীপ্সায় রচিত বলেই হয়তো-বা কোনো একটি স্থিরচিত্রের মধ্যে নিবদ্ধ না থেকে এসব কবিতার চিত্রকল্প যেন এক অস্থির, উদ্দাম বেগে সতত ধাবমান :

কোলাহল-কল্লোলের হিল্লোল-হিন্দোল /দুরন্ত দোলায় চড়ি'- 'দে দোল্ দে দোল্'/ উল্লাসে হাঁকিয়া বলি, তালি দিয়া মেঘে-/ উন্মাদ উন্মাদ ঘোর তুফানিয়া বেগে! [ঝড়:পশ্চিম-তরঙ্গ/ বিষের বাঁশী]

আবেগময়তা, উপলব্ধির সূক্ষ্মতা, কল্পনাপ্রসারী চারিত্রধর্ম এবং অপূর্বত্বের ব্যঞ্জনায় কখনো কখনো নজরুলের কবিতায় অনুপ্রাস-উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপকও সমাসোক্তি অলঙ্কার উত্তীর্ণ হয়েছে দ্যুতিময় চিত্রকল্পে;আবার কখনো-বা এই চিত্রকল্পগুলিতে কল্পনাপ্রসারী লাবণ্য, হৃদয়াবেগের ব্যঞ্জনা, উদ্ভাসনক্রিয়ার মাধুর্য, উপমান-চিত্র এবং চিত্রল দৃশ্যময়তা আপন রূপসত্তা অতিক্রম করে উন্নীত হয়েছে রূপান্তরের ব্যঞ্জনায়। যেমন :

আকাশে শিশির ঝরে, বনে ঝরে ফুল,
রূপের পালঙ্ক বেয়ে ঝরে এলোচুল;
কোন গ্রহে কে জড়ায়ে ধরিছে প্রিয়ায়-
উল্কার মানিক ছিঁড়ে ঝরে পড়ে যায়।...
হয়তো হবে না বলা, বাণীর বুদ্বুদে যাহা ফোটে নিশিদিন!

সময় ফুরায়ে যায়-ঘনায়ে আসিল সন্ধ্যা কুহেলি-মলিন। [স্তব্ধ রাতে/ চক্রবাক]

এক চিত্রকল্পের বিশেষ ইন্দ্রিয়চেতনা যখন পরমুহূর্তে অন্য চিত্রকল্পে ভিন্নতর সংবেদনার সৃষ্টি করে, কখনো বা একই সঙ্গে দুই-তিন বা ততোধিক চিত্রকল্পের ইন্দ্রিয়-সংবেদনার সমন্বয় ঘটে, তখন সৃষ্টি হয় মালা-চিত্রকল্প। এই জাতীয় চিত্রকল্পে সাধারণত মালা-উপমা বা মালা-রূপক অপূর্বত্বের ব্যঞ্জনা নিয়ে রূপান্তরিত হয় চিত্রকল্পে।[৫] এই ধরনের চিত্রকল্পে কখনো নজরুলের নিসর্গপ্রীতি, আবার কখনো-বা তাঁর বিদ্রোহীসত্তা প্রজ্ঞাশাসিত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ মানসতার সংস্পর্শে এসে হয়ে উঠেছে সংযত, সংহত এবং শূন্যতা তথা বেদনার প্রতীকী-ধারক :

ঠোঁট-ভরা মধু আসে কুলবধূ, বলে - 'আঁধারের পাখি,
নিশীথ নিঝুম চোখে নাই ঘুম, কারে এত ডাকাডাকি?
চলো তরুতলে, এই অঞ্চলে দিব সুখ-শেজ পাতি,
ভুলের কাননে ফুল তুলে মোরা কাটাইব সারা রাতি!
অসীম আকাশ আসে মোর পাশে তারার দীপালি জ্বালি,
বলে - 'পরবাসী! কোথা কাঁদো আসি? হেথা শুধু চোরাবালি!
তোমার কাঁদনে আমার আঙনে নিভে যায় তারা-বাতি,
তুমিও শূন্য, আমিও শূন্য, এসো মোরা হব সাথী। [ওগো ও চক্রবাকী/ চক্রবাক]

বস্তুত, কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় একটি ভাব, ভাবনা বা বক্তব্যকে স্বোপার্জিত বহুবর্ণিল শব্দমালার কেন্দ্রে রেখে আবর্তিত হয়েছেন দীর্ঘায়নে, অতিভাষ্যে। একজন প্রকৃত 'ইম্প্রেশনিস্ট' শিল্পীর মতো নজরুলও তাঁর কবিতাকে যেন গড়ে তুলেছেন চতুর্দিকের দৃষ্টিসম্পাতে। তিনি কবিতার ভাব ও বিষয়কে রঙ-রেখায় ও ধ্বনিময়তায় প্রতিস্থাপন করেছেন বলে ঐ ভাব বা বিষয়-ঘনত্বেই বস্তুবিশ্বের চলমানতা কখনো স্থিরত্বে, কখনো-বা চাঞ্চল্যে গতিময় হয়েছে এবং রঙ-আলো-বস্তুর আকৃতি মুছে দিয়ে এক চেতনাগভীর ভাবনার অনুষঙ্গ তৈরি করেছে;আবার কখনো-বা একটি বিশেষিকৃত বিন্যাস তৈরি করে তাতেই তিনি পুনঃপুন এঁকে গেছেন তাঁর মনন ও শিল্প-অভিজ্ঞতার দ্বৈতত্ব। যথাযথ বক্তব্যের জন্য প্রতীক সন্ধান না করে, বহিরাশ্রয়ী উপাদানের ঐশ্বর্যশালায় ভ্রমণ না করে সরাসরি রঙ ও রেখার দ্বারস্থ হয়েছেন; এবং সেখানে ভরে দিয়েছেন মাত্রান্তর, বাজিয়ে বাজিয়ে উপভোগ করেছেন; এ-এক আশ্চর্য সম্ভোগ !বিপুল, বিচিত্রমুখী বর্ণাশ্রয়ী শব্দের সমন্বয়ে তিনি কবিতাকে সাজিয়ে দিয়েছেন নববধূর মতো। সেজন্য তাঁর কবিতায় চর্চিত প্রতিটি চিত্রকল্পই স্বতন্ত্র সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত, নানা বর্ণমাত্রায় সমুজ্জ্বল দীপিত অরণ্যের মতো। আসলে বিচিত্রমাত্রিক বর্ণ যেন নজরুলের চিত্রকল্পের সঞ্জীবনী সুধা, তাঁর চিত্রকল্পের অরুণিমা, তাঁর প্রাতিস্বিকতা-চিহ্নিত কবিভাষার অনিন্দ্য-আত্মার সোনালি অলিন্দ :

১. নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া-
'আম্মা! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।' [মোহররম/ অগ্নি-বীণা]
২. রৌদ্র-তপ্ত আকাশের চোখে পরালে স্নিগ্ধ-নীল কাজল। [আশীর্বাদ/ ফণি-মনসা]
৩. হলুদ-চাঁপার ডালে, কেবলি বাতাসে
উহু উহু উহু করি' বেদনা জানায়! [তুমি মোরে ভুলিয়াছ/ চক্রবাক]
৪. ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালি ধানের শীষে। [নারী/ সাম্যবাদী]
৫. আমরা তাজা খুনে লাল করেছি সরস্বতীর শ্বেত কমল। [ছাত্রদলের গান/ সর্বহারা]

৩

নজরুলের ব্যবহৃত চিত্রকল্পমালা একদিকে যেমন রৌদ্ররসসঞ্চারী, অন্যদিকে তেমনি শক্তির প্রয়োগে, অত্যাচারীর ধ্বংসসাধনে ও উন্মত্ত নর্তনে তেজোগর্ভ, বীর্যবন্ত; আবার কখনো বা উৎপীড়িতের ক্রন্দন নিবারণের সাফল্যে এবং নারী-প্রকৃতি-সৌন্দর্য বন্দনায় ললিত, অনিঃশেষ প্রাণময়তায় স্পন্দিত।তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় সচেতনভাবে বর্ণময়, দীপ্তোজ্জ্বল চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন, এমন কথা বোধ করি বলা যাবে না। মূলত, বিষয় ও প্রকাশে যে অবিচ্ছেদ্যভাব, ছন্দে ও সুরে যে সমন্বয়, ভাব ও রূপে যে একাত্মতা, সসীমে ও অসীমে যে আসঙ্গ-তাকেই তিনি বহুবর্ণিল রূপকল্পে রূপদান করে স্বকৃত কবিভাষায় অতুলনীয়, অর্থমর্মরিত করে তুলেছেন।সহজাত কবিসত্তার প্রেরণায় এবং প্রাতিস্বিক শিল্পবোধ ও রোমান্টিকতার আন্তরধর্মেই বস্তুত বিচিত্র চিত্রকল্পের উপর্যুপরি ব্যবহারে এবং প্রতিসাম্যময় প্রতিসঙ্গে নজরুলের কবিতা স্বনিত-রণিত হয়ে আছে, সন্দেহ নেই।

তথ্য সূত্র :

১। ‘কবিতাকল্পনালতা’, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ২য় সংস্করণ ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯

২। ‘নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ’, বিশ্বজিৎ ঘোষ, নিউ এজ পাবলিকেশনস্, ঢাকা, ২য় সংস্করণ ২০০৫, পৃ. ৪৫

৩। ‘বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ’, সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫, পৃ. ৬৭

৪। ‘কবিতা : চিত্রিত ছায়া’, বার্ণিক রায়, ডি.এম লাইব্রেরি, কলকাতা, ১ম সংস্করণ ১৯৭২, পৃ. ৩৪

৫। ‘নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ’, বিশ্বজিৎ ঘোষ, পৃ. ৫০

গ্রন্থ ঋণ :

১। কাজী নজরুল ইসলাম, ‘নজরুলের কবিতাসমগ্র’, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ৪র্থ সংস্করণ ২০০০

২। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘নজরুল ইসলাম : কবিমানস ও কবিতা’, রত্নাবলী, কলকাতা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৩

৩। আতাউর রহমান, ‘নজরুলকাব্য-সমীক্ষা’, মুক্তধারা, ঢাকা, ১ম সংস্করণ ১৯৫১

৪। আবদুল মান্নান সৈয়দ, ‘নজরুল ইসলাম: কবি ও কবিতা’, নজরুল একাডেমি, ঢাকা, ১ম সংস্করণ ১৯৭৭

লেখক পরিচিতি :

মোরশেদুল আলম : পিএইচডি.ডি. গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, এবং সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উনাহত-সিংড়া কলেজ, বগুড়া, বাংলাদেশ।